# আমি নাথুরাম গড্‌সে বলছি

## কুশীলব বসু

নাথুরাম গড্‌সে সাধারণ অপরাধী ছিলেন না।
৬৭ বছর আগে আদালতে পেশ করা তাঁর জবানবন্দীর
উপর ২৭ বছর ধরে সরকারী নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।
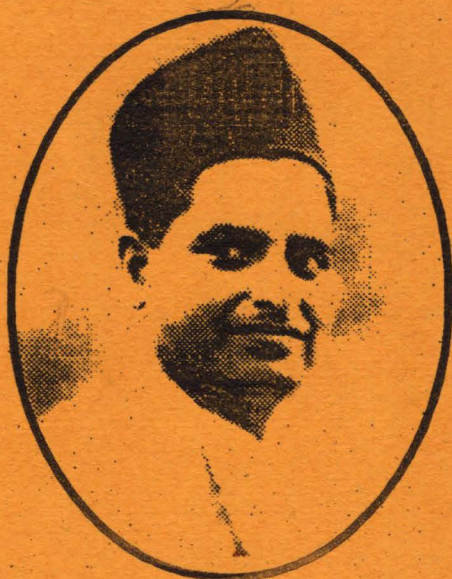
# আমি নাথুরাম গডসে বলছি

কুশীলব বসু

নলেজ পাবলিশিং হাউস
৫৮/১১১ প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৪৮

AMI NATHURAM GODSE BOLCHI
KUSHILAB BASU
আমি নাথুরাম গডসে বলছি
কুশীলব বসু

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই নভেম্বর, ২০১৬

প্রকাশক ঃ নলেজ পাবলিশিং হাউস
৫৫/১১১ প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৪৮

অক্ষর বিন্যাস ঃ অত্রী প্রিন্টার
এফ২১৩২২ যাদবপুর কে.আইটি মার্কেট
কলকাতা - ৭০০ ০৩২

মুদ্রণ ঃ আর্ট এ্যান্ড প্রিন্ট ক্রিয়েশন
৯০, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্টীট, কলকাতা - ৭২
মো ঃ ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

প্রচ্ছদ ঃ মিঠুন সরদার

ISBN 81-85709-34-3

মূল্য ঃ ৩০ টাকা মাত্র

# কেন এই বই

গান্ধী হত্যা বিচার স্বাধীন ভারতে প্রথম রাজনৈতিক বিচার এবং এই বিচার অনেকটা যীশুখ্রিষ্টের বিচার পর্বের সঙ্গে তুলনীয় যা ঘটেছিল বহু শতাব্দী আগে। এই হত্যা বিচারের সঙ্গে অনেকে তুলনা করেন এই দেশেরই বহু দশক আগে ঘটে যাওয়া এক বিচার পর্বের সঙ্গে যা ভারতের জনমনে এবং তৎকালীন সংবাদ মাধ্যমে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। তা হল ভাওয়াল সন্নাসী বিচার। গান্ধীহত্যা বিচার ছিল এদেশের সবথেকে ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘায়িত বিচার। শুধু তাই নয় এই গান্ধীহত্যা বিচারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ভারত ইতিহাসও। জড়িয়ে রয়েছে দেশভাগ, দাঙ্গা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব সু প্রসঙ্গ, কংগ্রেস দলের ভূমিকা এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং আরও অনেক বিষয় ঘটনার আলেখ্য। যা আমরা টেনে নিয়ে চলেছি বর্তমানেও এটা নিছক খুনের ইতিহাস নয়, এটা একটা সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই নাথুরাম গডসে-কে শুধু খুনের নিক্তিতে মাপা সঠিক ইতিহাসের অঙ্গ হতে পারে না। তাই প্রয়োজন বিশ্লেষণের। কারণ কেন এক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক এমন কঠিন, অপ্রিয় এবং একই সঙ্গে কঠোর কাজে ব্রতী হলেন? কেন বিচার সভায় তার বক্তব্যকে এক রাজনৈতিক থিসিস হিসেবে আখ্যাত করা হল এবং কেন নাথুরাম বিচার সভায় বললেন যে গান্ধীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে দেওয়া উচিত নয়? কেন নাথুরাম বলেছেন আমি প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন তার সৃষ্ট এই পবিত্র ভূমিকে কলুষিত করার অপরাধ থেকে।

এই বিষয়ে তৎকালীন এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবী শ্রী তপন ঘোষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি, গান্ধীহত্যা সংক্রান্ত এক নিরপেক্ষ গবেষণা গ্রন্থ রচনার জন্য। যে গবেষণা গ্রন্থটি আমাদের এই বইয়ের যাবতীয় তথ্যের মূল উৎস।

# ষড়যন্ত্রের গন্ধ, গান্ধী হত্যার ফাইল পুনরায় খোলার আর্জি সুব্রহ্মণিয়ম স্বামীর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (সংবাদ সংস্থা): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার ফাইল পুনরায় খুলতে চান বিজেপির অত্যন্ত পরিচিত নেতা সুব্রহ্মণিয়ম স্বামী। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে, স্বামীর দাবি, গান্ধী হত্যার তদন্ত রিপোর্টে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

স্বামীর মতে, গান্ধীজি খুন হওয়ার পর যে ছবি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে স্পষ্টভাবে তাঁর দেহে চারটি বুলেট বিঁধে থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু শুনানিকালে শুধু তিনটি বুলেটের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসে শুনানি চলাকালে আদালতে জানায়, গান্ধীর উপর শুধু দু'টি বুলেট চালাতেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্বামীর আরও দাবি, একটি ইতালিয়ান ব্যারেটা পিস্তল থেকেই গান্ধীজিকে গুলি করা হয়েছিল। এই সময় ব্রিটিশ সেনারা এ ধরনের পিস্তল ব্যবহার করত। এমনকী, গুলি লাগার পর গান্ধীজিকে পার্শ্ববর্তী কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন, সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন এই বিজেপি নেতা। গান্ধীজি খুন হওয়ার পর তাঁর ময়নাতদন্ত হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। তাই গান্ধী হত্যা মামলার ফাইল পুনরায় খোলার জন্য সুব্রহ্মণিয়ম স্বামী খুব শীঘ্রই এনডিএ সরকারের কাছে আবেদন জানাবেন বলে জানা গেছে।

গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসের কুশপুতুল জ্বালিয়ে প্রতিবাদ প্রদর্শন যুবইন্দের কংগ্রেস কর্মীদের। রবিবার, ভোপালে।

এদিকে, টিপু সুলতান 'ফরাসিদের দাস'। তার জন্ম জয়ন্তী পালন করার কোনও মানে নেই। এমনই কটাক্ষ করে বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়ম স্বামী। ১৮ শতাব্দীতে মহীশূরে রাজত্বকারী টিপু সুলতান প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্য নয়। ফ্রান্সের সঙ্গে আঁতাত হয়েছিল বলেই। কর্নাটকে একটি সংস্থা আয়োজিত বিতর্ক সভায় টিপু সুলতান প্রসঙ্গে এমন মন্তব্যই করেন স্বামী। একইসঙ্গে বলেন, "বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি, সেই সমস্ত তথ্য প্রমাণ কেন্দ্র দেবে।"

ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাওয়া টিপু সুলতানের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা কর্নাটকে। সম্প্রতি কর্নাটক সরকার টিপু সুলতানের জন্মজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। কোডাগু জেলায় এই নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে মৃত্যু হয়েছে দুজনের।

সেই প্রসঙ্গ ধরে ফের টিপু সুলতানের সমালোচনায় সরব হল বিজেপি। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়ম স্বামীর বক্তব্য, ব্রিটিশদের হারাতে নেপোলিয়ান টিপুর সঙ্গে মৈত্রী পাতিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের হাতে হারতে হয়েছিল ফ্রান্সকে। সেই সময় টিপু সুলতান ছিলেন ফরাসিদের দাস। দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে টিপুর এমন কোনও ভূমিকা নেই যাতে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করতে হবে।

দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকার ১৫ই নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিলিপি

## মুখবন্ধ

ইতিহাসের এক বিতর্কিত চরিত্র নাথুরাম গডসে। একদা ঘোর গান্ধী অনুগামী এবং গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম সহযাত্রী নাথুরাম কি কারনে ঘোর গান্ধী বিরোধী হয়ে পড়লেন শুধু তাই নয় ভেবে নিতে এক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধান্বিত হলেন না যে হিন্দু ধর্মের স্বার্থে গান্ধীর মুসলিম তোষণ নীতিকে একমাত্র স্তব্ধ করা সম্ভব হবে যদি গান্ধীকে চিরতরে স্তব্ধ করা যায়। তাই ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রায় দু'মাসের মাথায় হত্যা করলেন গান্ধীকে। কিন্তু কে ছিলেন এই নাথুরাম গডসে? তিনি কি শুধু একজন হত্যাকারী মাত্র। গান্ধী হত্যার পর দেশবাসীর ধারণা ছিলো যে তার স্থান হবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ এটা প্রমাণ করেছে যে নাথুরামের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে হিন্দুজাতির মান-অপমানের প্রশ্নটিও। তাই এখনও নাথুরাম গডসের মৃত্যুদিন পালন করা হয়। শুধু তাই নয় গডসের স্মৃতিতে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়। গত বছর মহারাষ্ট্রের থানে এবং উত্তরপ্রদেশের মেরঠে তার মৃত্যুদিন উপলক্ষে 'বলিদান দিবস' পালন করে ভারতীয় হিন্দু মহাসভা। উল্লেখ্য যে এই বলিদান দিবস উপলক্ষে নাথুরাম গডসের নামে একটি ওয়েবসাইটও চালু করে হিন্দু মহাসভা। নাথুরামকে দেশের অধিকাংশ মানুষ গান্ধী হত্যার আসামী হিসেবে ভেবে

নিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু নাথুরামের কর্মময় জীবন যে কত বর্ণময় ছিলো তা প্রকাশ করাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। পুনের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের চতুর্থ সন্তান চিন্তা ভাবনায় ছিলেন খুবই উৎকৃষ্ট। গতানুগতিক শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও টেলারিং-এর ডিপ্লোমা ছিলো তার এবং পুণা শহরে ছিলো তার একটি টেলারিং এর দোকানও এবং বলা বাহুল্য এই টেলারিং-এর দোকান থেকেই তার সংসার চলতো। তবে টেলারিং-এর দোকান চালাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিন্তু নিরন্তর পড়াশোনাও চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইতিহাস ছিলো তার অন্যতম আকর্ষনীয় বিষয়। এই সময়ের মধ্যেই তার পড়া হয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসই নয়, ইংল্যান্ড ফ্রান্স এমনকি আমেরিকা ও রাশিয়ার ইতিহাসও। নাথুরাম যেমন সাভারকার নিয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন ঠিক তেমনি গান্ধীকে জানার ক্ষেত্রেও ছিলো তার প্রবল উৎসাহ। তবে প্রথম থেকেই নাথুরাম হিন্দু ইতিহাস এবং বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত চিন্তার প্রতিও তার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। জাতপাত প্রথা রোধ করতেও তাকে সচেষ্ট হতে দেখা যায়। নাথুরাম তার জবানীতে উল্লেখ করেছেন তার আগ্রহের বইগুলি সম্পর্কে। এর মধ্যে রয়েছে দাদাভাই নৌরজী, স্বামী বিবেকানন্দ, গোখলে এবং বালগঙ্গাধর তিলক। নাথুরাম মনে করতেন দেশের স্বাধীনতার জন্য যেমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত ঠিক একই ভাবে মুসলিম 'বিজয়' এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা উচিত। গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সময় হিন্দু-মুসলমান বিষয়টি নিয়ে নাথুরাম চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা করতে করতেই তাঁর মনে হয় গান্ধীর নীতি অযৌক্তিকভাবে মুসলিম তোষণেরই নামান্তর। বিশেষ করে

গান্ধী যখন 'কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড' কে মেনে নিলেন তখন থেকেই নাথুরাম অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার দিকে ঝুঁকলেন, কারন তার মনে হলো এই হিন্দু-মহাসভা, হলো হিন্দুদের একমাত্র সংগঠন এবং তারাই হিন্দুর স্বার্থে রুখে দাঁড়াতে পারবে এবং লড়াই করতে সক্ষম হবে।

ইতিমধ্যে ১৯৩২ সালে ডক্টর হেডগেওয়ার নাগপুরে প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। নাথুরাম যোগ দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে। নাথুরাম ছিলেন এই দলে যোগ দেওয়া প্রথম পর্যায়ের স্বেচ্ছসেবকদেরই একজন। কিছুকাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দলে থাকলেও পরে তিনি সক্রিয় সদস্য হন হিন্দু মহাসভা দলের। হিন্দু মহাসভা দলের নেতা এবং সভাপতি তখন বীর সাভারকার।

১৯৩৮ সালে নাথুরাম যোগ দিলেন 'হায়দরবাদ সত্যগ্রহ' আন্দোলনে এবং এই সত্যগ্রহ আন্দলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাকে কারাবরণও করতে হয়। এক বছর জেলে থাকাকালীন নাথুরাম জেলের মধ্যেই গড়ে তোলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দলের এক শাখা। শুধু জেলে বন্দিই নয়, জেলের মধ্যে তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল এক নারকীয় ও বর্বর অত্যাচারেরও। জেলের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' গানটি গাওয়ার জন্য তাকে নিজামের লেঠেল বাহিনীর হাতে বেত্রাঘাতের আঘাতও সহ্য করতে হয়েছিল। নিজামের জেল থেকে বেরিয়ে নাথুরাম হিন্দু-জাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে আরও একাত্ম হয়ে পড়লেন এবং হিন্দু মহাসভা দলকে আরও আন্দোলনমুখী করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু এই বিষয়ে দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার মতভেদের কারণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দল তিনি পরিত্যাগ করলেন এবং গড়ে তুললেন পুনা শহরে এক নতুন দল যার নাম হল "হিন্দু রাষ্ট্র দল"। এই দল গঠন করার সঙ্গে সঙ্গেই নাথুরামের মনে হতে লাগল যে প্রচারের বিষয়টিকেও

গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করলেন তারই অন্যতম সহযোদ্ধা এবং পুণা শহরেরই বাসিন্দা নারায়ণ আপ্তে (গান্ধী হত্যা বিচারে নাথুরামের সঙ্গে আপ্তেরও ফাঁসি হয়)। নাথুরামের সম্পাদনায় মারাঠা দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের ২৫শে মার্চ। দৈনিক সংবাদপত্রের নাম হয় "অগ্রণী"। এই পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদন লিখতেন নাথুরাম এবং তাতে গান্ধীর নীতিকে চাঁছা ছোলা ভাষায় আক্রমণ করা হতো, বিশেষ করে কংগ্রেস এবং গান্ধী সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে যে ভুল গুলো করেছিলেন বস্তুনিষ্ঠ কলমে তাকেই উন্মোচন করে দিতেন নাথুরাম।

কিন্তু ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য বেশি বিলম্ব করেনি। তাই বন্ধ হয়ে গেল মারাঠা দৈনিক সংবাদপত্র অগ্রণী। এতেও কিন্তু নাথুরামকে দমানো গেল না। নাথুরাম এবারে বার করলেন আরেকটি নতুন দৈনিক পত্রিকা। নাম "হিন্দুরাষ্ট্র"। নাথুরাম তাঁর সম্পাদক আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নারায়ণ আপ্তে।

গান্ধী হত্যা বিচার শুধু ভারতবর্ষই নয় বিশ্ব-ইতিহাসেও এক বিরল হত্যা বিচার ছিল। বিচারে অভিযুক্তদের তালিকা হল ঃ

১। নাথুরাম গডসে
২। নারায়ণ আপ্তে
৩। বিষ্ণু কারকারে
৪। মদন লাল পাওয়া
৫। গোপাল গডসে
৬। বীর সাভারকার
৭। ডঃ পারচুরে
৮। শঙ্কর

গান্ধী হত্যা বিচার পর্ব শুরু হয়েছিল ২২শে জুন, ১৯৪৮, দিল্লীর

লাল কেল্লায়। বিচার পর্বে ১৪৯ জনের স্বাক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল। সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ হয়েছিল ৭২০ পৃষ্ঠায়। এই হত্যাকান্ড সম্পর্কিত প্রায় ৪০৪টি নথি পেশ করা হয়েছিল এবং এছাড়াও হত্যাকান্ড সংক্রান্ত ৪০টি প্রামাণ্য সংবাদের কাগজপত্র জমা পড়েছিল। অভিযুক্তদের বয়ান লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল ৮ই নভেম্বর থেকে এবং তা চলেছিল ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত। অভিযুক্তদের বয়ানের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১০৬।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দিল্লীর রেড ফোর্টের (লাল কেল্লা) এই বিচার প্রক্রিয়া ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘায়িত বিচার প্রক্রিয়া। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে প্রকৃত গান্ধী হত্যার (অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮) ১০দিন আগে অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের ২০ তারিখে গান্ধীকে হত্যা করার আরও একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল যদিও সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। এই হত্যাকান্ড সংগঠিত করে অবিভক্ত পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু যুবক মদন লাল পাওয়া। তার নেতৃত্বেই বিড়লাবাড়ীর মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। অবশ্য ঘটনাস্থল থেকে মদনলালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। মদনলাল ছিল পাঞ্জাবের মন্টগোমারি জেলার অধিবাসী। ১৯৪৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর সে একজন টেলিগ্রাফিস্ট হিসেবে নৌবিভাগে চাকরী পায়। এর বছর খানেক পরে চাকরী থেকে ছুটি নিয়ে সে প্রস্তুতি শুরু করেছিল 'প্রভাকর' পরীক্ষায় বসার জন্য। কিন্তু দেশভাগ তাঁর জীবনকে খন্ড বিখন্ড করে দেয়। সব জমি ফেলে রেখে একজন উদ্বাস্তু হয়ে সে তার জন্মভূমি থেকে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই মদনলালকেও প্রকৃত গান্ধীহত্যা বিচারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং বিচারের রায়ে তাকে যাব্বজীবন কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।

গান্ধী হত্যাকান্ডে নাথুরামের সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হয় নারায়ণ আপ্তেকেও। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীকে হত্যা করবার জন্য কোথায় পিস্তল চালানোর মহড়া নাথুরাম করেছিলেন তা একমাত্র জানতেন এই নারায়ণ আপ্তেই। তরুণ মারাঠা ব্রাহ্মণ নারায়ণ আপ্তে নাথুরামের থেকে ২ বছরের ছোট ছিল। ১৯৩৯ সালে নারায়ণ আপ্তে আহমেদনগরে হিন্দু মহাসভা দলে নাম লেখায়। হিন্দু মহাসভা দলে যোগ দেওয়ার দু'বছর পরে নাথুরামের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় এবং এই যোগাযোগ ক্রমশ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

গান্ধীহত্যা বিচারের অন্যতম অভিযুক্ত ছিল বিষ্ণু কারকারে। কারকারের জন্ম মহারাষ্ট্রের ছবির মতো গ্রাম রত্নাগিরিতে। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বিষ্ণু কারকারে সবসময়েই হিন্দু দর্শন ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিল। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে তাকে পড়াশোনার পাঠ একেবারে চুকিয়ে ফেলতে হয়েছিল। পেট চালাতে তার নিজের বাসস্থান আহমেদনগরে বিষ্ণু কারকারে খুলেছিল এক চায়ের দোকান। কিন্তু বেশিদিন সে এই চায়ের দোকান চালাতে না পেরে সক্রিয় রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে এবং হিন্দু মহাসভার নিচুতলার একজন কর্মী থেকে শেষ পর্যন্ত দলের জেলা কমিটির নির্বাচিত সম্পাদক হয়।

গান্ধীহত্যা বিচারের এই দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ায় সারা দেশে তো বটেই এমনকি বিদেশেও প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন খবরের কাগজগুলো এই হত্যাকান্ডের উপর নানা খবর এবং বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে চলে। বিচারপর্ব শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্যতম অভিযুক্ত দিগম্বর রামচন্দ্র বাদগে রাজসাক্ষী হয়ে যান। এই দিগম্বর বাদগে ছিল এক অস্ত্র দোকানের মালিক। উল্লেখ্য যে এই বাদগের সঙ্গেই নাথুরাম, নারায়ণ আপ্তে এবং বিষ্ণু কারকারের

যোগাযোগ ঘটে উঠেছিল অস্ত্র ব্যবসার সূত্র ধরেই। এছাড়া অন্যতম অভিযুক্ত ডঃ পারচুরেই নাথুরাম এবং নারায়ণ আপ্তেকেই স্বয়ংক্রিয় পিস্তল দিয়েই সাহায্য করেছিল।
প্রত্যেক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেই হত্যা, অস্ত্রের ব্যবহার এবং বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়অস্ত্র রাখা ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই গান্ধী হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন বোম্বাইয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার এবং বিখ্যাত দেশপ্রেমিক বীর সাভারকারও। সাভারকার ছিলেন বোম্বাইয়ের দাদর অঞ্চলের বাসিন্দা। নাথুরাম এবং আপ্তের সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শুধু তাই নয় নাথুরাম যখন নারায়ণ আপ্তের সঙ্গে দৈনিক অগ্রণী পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তখন এই সাভারকারই পত্রিকাটি যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন।
গান্ধী হত্যাকান্ড বিচারপর্বে যে সমস্ত আইনজীবীরা অংশ নিয়েছিলেন তারা সব ছিলেন ভারত বিখ্যাত আইনজীবী। একথা মনে রাখা দরকার যে এই বিচারপর্বে সরকারি আইনজীবীদের প্রায় ১৪৯জন সাক্ষীকে জেরা করতে হয়েছিল। ফাঁসির আগে নাথুরাম গডসেকে রাখা হয়েছিল মহারাষ্ট্রের আম্বালা জেলে। সেই জেলের ১০ফুট বাই ১০ফুট ছোট্ট সেলে বসেই নাথুরাম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সামনে এক আবেদন তিনি পেশ করবেন যদিও নাথুরামের এই দাবি সরকার পক্ষ থেকে মঞ্জুর করা হয়নি। তাঁর আবেদনের মাধ্যমে ইংল্যান্ড এবং সারা বিশ্ব যাতে গান্ধী হত্যার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে পারে সেটাই ছিল নাথুরামের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রিভি কাউন্সিলের কাছে আবেদনের অনুমতি বাতিলের ১৪ দিনের মাথায় বিশেষ বিচারক এস.এস. দৌলত দুই বন্দির (নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তে)

ফাঁসির পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিলেন। বিশেষ বিচারক এস.এস. দৌলত ১৯৪৯ সালের ১৫ই নভেম্বর ফাঁসির দিন হিসেবে স্থির করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ ১৫ই নভেম্বরই নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

নাথুরাম বিনায়ক গডসে
জন্ম ঃ ১৯ শে মে ১৯১০
ফাঁসি ঃ ১৫ই নভেম্বর ১৯৪৯

# আমি নাথুরাম গডসে বলছি

(জেলের মধ্যে রাতের পর রাত জেগে নাথুরাম গডসে এই বয়ান তৈরী করেছিলেন এবং প্রায় ৯৩ পৃষ্ঠার এই বয়ান পড়তে তাঁর সময় লেগেছিল প্রায় পাঁচ ঘন্টা। এই বয়ানকে তৎকালীন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এক রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেব আখ্যাত করেছিলেন। বক্তব্য শুরু করার আগে নাথুরাম উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলন, তার বক্তব্য পুরোপুরি প্রকাশিত হোক বা না হোক কখনই যেন তা বিকৃতভাবে ছাপা না হয়।) বয়ানটি হচ্ছে ঃ

এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আমি হিন্দুধর্ম, হিন্দু ইতিহাস এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। আমি সামগ্রিকভাবে হিন্দু ধর্মের জন্য গর্ববোধ করি। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুক্ত চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হই। কোনও কুসংস্কারকেই আমি মান্যতা দিতাম না এবং এই উদ্দেশ্যেই আমি অস্পৃশ্যতা এবং জাতপাত প্রথা রোধ করার সংগ্রামে নেমে পড়ি। আমি প্রকাশ্যেই জাতপাত প্রথা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। আমি মনে করতাম হিন্দুদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকা উচিত নয় এবং

প্রত্যেক হিন্দুরই থাকা উচিত সমানাধিকার এবং তা সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তো বটেই। আমি বিশেষ পড়াশোনা করতে পারিনি কিন্তু বই পড়াতে ছিলো আমার প্রবল আগ্রহ। আমি দাদাভাই নৌরজী, স্বামী বিবেকানন্দ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং বালগঙ্গাধর তিলকের বই পড়েছি। এছাড়া আমি অধ্যয়ন করেছি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসই নয়, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এমনকি আমেরিকা ও রাশিয়ার ইতিহাসও। আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদকেও। তবে আমি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছি বীর সাভারকার এবং গান্ধী কি লিখেছেন এবং কি বলেছেন সে সম্পর্কে। ১৯২৩-৩০ সাল থেকে যখন কংগ্রেস দল প্রথম ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল আমি তখন শুধুমাত্র ছাত্র হলেও একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে এই অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম। আর খবরের কাগজে এং অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে যা যা সংবাদ প্রকাশিত হতো তার সবগুলিই আমি গোগ্রাসে গিলতাম। এই প্রক্রিয়ায় থেকে এই আন্দোলনের প্রতি আমি এতটাই উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম যে আমি ঠিকই করে ফেললাম যে ইংরেজ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী

হিসেবেই আমি আমার জীবন কাটিয়ে দেবো। এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের বিষয়টিও আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো আর এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে আমি ক্রমশ বুঝতে পারলাম যে গান্ধীর নীতি ও কর্মসূচী ভীষণ ভাবেই মুসলিমপন্থী। তখন থেকেই আমার মনে হতে লাগল যে তাহলে এবার হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুত্বের জন্য আমার কিছু করা উচিত। আবার গান্ধী যখন 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড'কে মেনে নিলেন তখন থেকেই আমি হিন্দু মহাসভার দিকে ঝুঁকলাম এবং তখন আমার মনে হলো যে এই হিন্দু মহাসভাই হলো হিন্দুদের একমাত্র সংগঠন যারা হিন্দু জাতির স্বার্থে লড়বে এবং প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

১৯৩২ সালে ডক্টর হেডগেওয়ার যখন নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন বুঝতে পারলাম যে এটা আমার কাছে মস্ত একটা সুযোগের মতো তাই কালবিলম্ব না করে আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে যোগ দিলাম। আমাকে এই সংগঠনের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। এরপর আমি অবশ্য যোগ দিই হিন্দু মহাসভা দলে। তখন এই দলের সদ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বীর সাভারকার। ১৯৩৮ সালে আমি

অংশগ্রহণ করলাম 'হায়দারবাদ সত্যগ্রহে' এই সত্যগ্রহে অংশগ্রহণ করে আমি কারাবাস করি এবং জেলের মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গাওয়ার অপরাধে নিজামের লেঠেল বাহিনী আমাকে বেত্রাঘাতও করে।

হায়দারবাদ থেকে ফিরে এসে আমি পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লাম। এবার আমার লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সংঘকে আরও কট্টর ও আন্দোলনমুখী করে গড়ে তোলা। কিন্তু আমি ক্রমশ বুঝতে পারলাম যে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি এবার নতুন দল গড়ে তুলবো। হিন্দু রাষ্ট্র দলই হলো সেই নতুন দল যার পত্তন আমি করলাম পুণার মত শহরে। আমাদের দলের দাবী ছিলো - আমরা যেন সবক্ষেত্রেই হিন্দু ধর্ম যাতে আরও শক্তিশালী হতে পারে সে ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করতে পারি। আমি দিকে দিকে বিপুলভাবে সাড়া পেতে লাগলাম। আমার দল গড়ে তুলতে লাগল নতুন নতুন ক্লাব। শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও আমরা করলাম। তারপর আমরা নজর দিলাম প্রচারের দিকে। আমার এক পুরোনো বন্ধু ছিল নারায়ণ আপ্তে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা মারাঠী ভাষায় নতুন এক দৈনিক সংবাদপত্র বার করলাম এবং আমিই হলাম তার সম্পাদক। কিন্তু সরকার

এই পত্রিকাকে বেশিদিন চলতে দিলো না। কিন্তু আমি হাল ছেড়ে না দিয়ে আবার নতুন এক দৈনিক পত্রিকা বার করলাম। পত্রিকাটির নাম দিলাম 'হিন্দু-রাষ্ট্র'। এটিরও সম্পাদক হলাম আমি আর এই পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন আমার বন্ধু ও সহযোদ্ধা নারায়ণ আপ্তে। এটিও অবশ্য দৈনিক পত্রিকা হিসেবেই প্রকাশিত হতে লাগলো।

নাথুরাম গডসে বিচারসভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে। তার বক্তব্যের পরিধি ছিলো প্রায় ৫০টি প্যারাগ্রাফের এবং যা বিভক্ত ছিলো পাঁচটি অনুচ্ছেদে। বক্তব্যের মাঝখানে অবশ্য বিচারকেরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে - এটা বিচারসভা, কোনও বক্তৃতামঞ্চ নয়। নাথুরামের বক্তব্যের প্রথম অনুচ্ছেদের শিরোনাম ছিল — অভিযোগের উত্তরে ঃ

মাহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করার পর আমার পালিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছাই ছিলো না। পালিয়ে যাওয়ার কথা আমি কখনও ভাবিনি। আমি নিজের উপর গুলি ছোড়ার কোনও চিন্তাকেও আমল দিইনি। আমার শুধুমাত্র একটাই ইচ্ছা ছিলো যে আমি যেন আমার চিন্তাকে বিচারসভার মাধ্যমে সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি।

আমি হিন্দুরাষ্ট্রে দল গঠন করার পরেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার এবং এই উদ্দেশ্যেই আমি গোপন সংগঠন গড়ার কথা ভেবেছিলাম। তাই প্রথম

> প্রথম গান্ধীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কিন্তু শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের আয়োজন করতে শুরু করেছিলাম। আর বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতো গান্ধীর তথাকথিত যে সব প্রার্থনা সভাগুলো হতো তার সামনেই। বলা বাহুল্য গান্ধী সেইসব প্রার্থনা সভাগুলোকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তার সব ক্ষোভকে উগরে দিতেন।

নাথুরামের বক্তব্যের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শিরোনাম ছিলো গান্ধী নীতির মূল্যায়ণ এই অনুচ্ছেদটিও দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলো। প্রথম ভাগটি এই হত্যাকান্ডের প্রেক্ষাপটের যে ঘটনাবলী তাকে ভুল ধরা, যা নাথুরামের ভাষায় "পুরোপুরি এবং সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক।"

> মধ্যভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে কোনও দিনই হিন্দুদের বাসস্থান ছিল না। মুসলমানরা ধারাবাহিকভাবেই এই দেশে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছিলো সেই দশের শতক থেকেই এবং এই দেশের অধিকাংশ ভূখন্ডেই তাদের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলো।
>
> যদিও মারাঠা শক্তির উথান, রাজপুতদের বিদ্রোহ এবং শিখদের সংগ্রাম এই মুসলিম শাসনকে বারবার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছিলো।
>
> শিবাজী, রাণাপ্রতাপ এবং গুরু গোবিন্দ সিং মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

দ্বারা হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সমাজের পুনরুত্থান ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমাদের দেশের উপর যে মুসলিম আগ্রাসন ঘটেছিলো তাঁরা একে রুখে দিয়েছিলেন। তারা এককথায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে দখলদার মুক্ত করেছিলেন। উল্টোদিকে প্রায় ৩০ বছর ধরে দেশের অবিশংবাদী নেতা হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীর আমলেই কিন্তু ঘটেছিলো বেশি করে মন্দিরের উপর আক্রমণ, জোর করে ধর্মান্তরকরণ এবং আরো বেশী করে মুসলিমদের দ্বারা নারীদের উপর অত্যাচার এবং যার পরিণতি ঘটেছিল দেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমি হারানোর মধ্য দিয়ে। সুতরাং শিবাজী, রাণাপ্রতাপ এবং গুরু গোবিন্দ সিংকে বিপথগামী দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়ে গান্ধী নিজের চরিত্র এবং উদ্দেশ্যকেই বেশি করে উম্মোচিত করে দিয়েছেন। তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তাদের দেশপ্রেমের তুলনায় গান্ধী ছিলেন নিতান্তই ক্ষুদ্রকায় এক ব্যক্তি। ভারতবর্ষের মানুষেরা যে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে তা একমাত্র গান্ধীর কৃতকর্মেরই ফলেই।

যুদ্ধ এবং কূটকৌশলে উন্নত হওয়ার ফলেই ইংরেজরা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। যদিও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ তখনও ছিলো। কিন্তু এক

**সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায় এতটা অসহিষ্ণু আগে কখনও ছিলো না। কারণ ইংরেজরাই ছিলো তখন উভয়েরই শত্রু। একমাত্র গান্ধীর নীতির জন্যেই শেষ পর্যন্ত মুসলমানেরা আলাদা রাজ্যের দাবী জানাতে শুরু করে। গান্ধীর জন্যেই এই দেশভাগ।**

এইবার নাথুরাম তার বক্তব্য অনুসারে গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মাবলীর ব্যাখ্যা শুরু করছেন। এতে তিনি টেনে আনলেন ১৯১৪ সাল থেকে গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে তার ভূমিকা নেই।

**দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী ছিলেন ভারতীয়দের অবিচ্ছেদ্য এক কান্ডারী। ভারতে পদার্পণ করে তাই গান্ধী লাভ করেছিলেন ভারতীয়দের অগাধ আস্থা। এদেশের সব সম্প্রদায়ই তাঁকে নেতা বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষ কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়। হোমরুল আন্দোলন, স্বাশাসিত সরকার এবং এমনকি তখন স্বাধীনতাই ছিলো ভারতীয় রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা একেবারেই মেলে না। ভারতবর্ষের এই জটিল পরিস্থিতিতে আবার যুক্ত হয়ে পড়েছিল আরও কয়েকটি বিষয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোটদান, পৃথক নির্বাচক মন্ডলী ইত্যাদি যা বৃটিশ তৈরী করেছিলো নিজেদের স্বার্থে অর্থাৎ এক কথায় বৃটিশরা সাম্প্রদায়িকতা**

ব্যাপারটিকে নিজেদের মতো করেই দেখেছিলো। কিন্তু গান্ধী এর তাৎপর্য কখনই বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি ভারতবর্ষকে অখন্ড দৃষ্টিতে দেখার ফলে বিভক্ত ভারতের সমস্যাগুলোকে কখনই অনুধাবন করতে পারেননি।

১৯১৯ সাল থেকেই আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম যে মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের জন্য গান্ধী তাদের একটার পর একটা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। পরিশেষে তো তিনি তাদের সব কিছুর পিছনেই দাঁড়িয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মিথ্যে দোহাই দিয়ে তিনি খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের মাধ্যমে আলাদা নির্বাচকমন্ডলী যখন গঠন করা হলো এবং যার মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের পৃথক রাজনৈতিক সত্তাকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে বৃটিশরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে ভাঙনের পথে নিয়ে যেতে সফল হলো তখনও কিন্তু গান্ধী নির্বিকারভাবে সব কিছু মেনে নিলেন। গান্ধী এমনকি সিন্ধু প্রদেশকেও আলাদা করার প্রস্তাবে সায় দিলেন। এই প্রক্রিয়াতেই গঠিত হলো নতুন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এই সময়েই মুসলমানদের একটার পর একটা দাবী মেনে নিয়ে তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন তিনি

পাবেন। প্রখর বাস্তববাদী জিন্না, যিনি ছিলেন তখন মুসলিম লিগের একচ্ছত্র অধিপতি। সব সময় তার দাবীর সংখ্যা বাড়িয়েই যাচ্ছিলেন। কিন্তু এতেও গান্ধীর মতিগতির কোনও পরিবর্তন নেই। শেষে ১৯৪০ সালে দু'জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জিন্না হাজির হলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবী নিয়ে। জিন্না কিন্তু বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টার কোনও ব্যাঘাত ঘটালেন না এবং এর দ্বারা তিনি বৃটেনের সহানুভূতি আদায় করে নিতে পারলেন। বৃটেন জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন জানালো। উল্টোদিকে যুদ্ধ শেষ হলে গান্ধীর কংগ্রেস 'যে কোন মূল্যেই শান্তি' এবং 'যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় বসা' মনোভাবের ফলে জিন্নার নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। এর পরিণতিতে জিন্না দেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমি পেয়ে গেলেন এবং এতে শুধু একটা একনায়কতন্ত্র দেশের জন্মই হলো শুধু তাই নয় দেশের ২০লক্ষ মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেলো। আমি যখন দেখতে পেলাম যে এত রক্তপাত এবং ধ্বংসের পরেও গান্ধী সেই একই তোষণের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন তখন আমার দেহ ও মন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং আমার সহ্যের সব সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলাম যে গান্ধী সেই সেই জিনিসই করতে চাইছেন যা বৃটিশরা পছন্দ করে। ভারত ভাগ করার বৃটেনের

ষড়যন্ত্রকে গান্ধী পুরোপুরি ভাবেই মদত দিয়েছেন।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে নাথুরাম গান্ধী হত্যার সপক্ষে তার মত ব্যাক্ত করেছেন।

প্রায় ৩২ বছর ধরে গান্ধীর মুসলিম তোষণের রাজনীতি চালিয়েও এবং সেই পথ থেকে ক্ষান্ত না হয়ে পরিশেষে গান্ধী যখন মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে অনশনে বসলেন তখন আমি আর স্থির এবং স্বাভাবিক থাকতে না পেরে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম যে গান্ধীর জীবনের চরম ছেদ ঘটানো দেশের স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন।

এবারে আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে গান্ধীর মুসলিম তোষণ নীতির বিষয়গুলির উল্লেখ করি।

১। খিলাফত আন্দোলন

২। মোপলা বিদ্রোহ

৩। আফগানিস্থানের আমীরের অনুপ্রবেশ

৪। আলাদা সিন্ধু প্রদেশ গঠন

৫। কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড

৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং

৭। সর্বপরি দেশভাগ

আমি এটাও এবার ভালভাবেই বুঝতে পারলাম যে গান্ধী সেটাই করতে চান যা মুসলমানেরা পছন্দ করে। একটার পর একটা পরাজয়ের পরেও গান্ধী কিন্তু কখনই তার মত অনুযায়ী

তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথ থেকে সরে আসেননি। বাজীকরের মতো এই হিন্দু মুসলমান 'ঐক্যের' নেশায় তিনি আরও বুঁদ হয়ে থেকেছেন। এই বিষয়ে তার লক্ষ্য ছিলো জিন্নার সমর্থন আদায় করে দেশের একমাত্র নেতা বনে যাওয়া। কিন্তু মুসলিম লিগ এবং জিন্না গান্ধীর এই নীতিকে কোনও আমলই দেননি। ১৯২৯ সালের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের পর থেকেই তারা কংগ্রেস থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতার দাবী জানায়।

এরপর তো গান্ধীর মুসলমানদের প্রতি কোনও দুর্বলতা দেখানো উচিত ছিলো না কিন্তু তবুও তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কাছে নতি স্বীকার করেন।

এরপরে আমি যেটা উল্লেখ করতে চাই তা হলো বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে ডেকে আনা এবং এর ফলেই কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ঘোষিত হয়ে যায় আর এই অ্যাওয়ার্ড ঘোষিত হবার ফলেই সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোটদানের বিষয়টি আইনসিদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৯ সালে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগও ছিলো কংগ্রেস দলের এক মারাত্মক ভুল নীতির

পরিচায়ক।

কিন্তু মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের পথে না হেঁটে মুসলিম স্বার্থকেই রক্ষা করেছিলো। গান্ধীর এই উচ্চাকাঙ্খা ছিলো যে তিনি কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই নেতা হবেন কিন্তু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস শুধু দেশের বা হিন্দুদের ক্ষতিই করলো না, ক্ষতি করলো গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদেরও। মহাত্মার কর্মনীতির জন্যেই হিন্দুদের মৌলিক অধিকার, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সব ক্ষেত্রেই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিলো।

এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গে আসি। আসি 'ক্রীপস্ মিশন' প্রসঙ্গেও। দুটি ক্ষেত্রেই তার ভূমিকা ছিলো নেতিবাচক। যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক তিনি নিজেই দিয়েছিলেন সেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে তিনি হঠাৎ স্থগিত ঘোষণা করে দিলেন শুধু তাই নয় তিনি নিজেই বললেন যে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা উল্লেখ করার বিষয় যে দেশের মানুষ কিন্তু তাঁরই ডাকে সাড়া দিয় 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বলে হিংসাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ভাষার প্রশ্নেও গান্ধীর মুসলমানদের প্রতি দুর্বলতা নিয়ে। মুসলমানদের সন্তুষ্টিকরণের স্বার্থেই হিন্দী

> ভাষার পরিবর্তে গান্ধী হিন্দুস্থানী ভাষার রূপায়ণ চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে হিন্দুস্থানী ভাষাতে 'বাদশা রাম' বা 'বেগম সীতা'র উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শব্দের অনুসরণে গান্ধী তো মিষ্টার জিন্নাকে শ্রীযুক্ত জিন্না বা মৌলানা আজাদকে পন্ডিত আজাদ বলার সাহস দেখাতে পারেননি। শুধুমাত্র হিন্দুদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই গান্ধী সব সময় মুসলিম তোষণ চালিয়ে গিয়েছেন।

নাথুরামের বক্তব্যের এই অনুচ্ছেদের তৃতীয় অংশের শিরোনাম ছিলো 'গান্ধী এবং স্বাধীনতা' এই বিষয়টি নিয়ে বিচার পর্বে নাথুরাম '১৯১৪ সাল থেকে একমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন গান্ধী' এই ধারণাকে নাস্যাৎ করে দিয়েছেন। এই বক্তব্যও তিনি খন্ডন করেছেন যে গান্ধীর নেতৃত্বেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেই অর্থে নাথুরামের বক্তব্য হলো গান্ধীকে কখনই Father of the Nation বা জাতির পিতা বলা যায় না।

> ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সব সময়েই জাগরুক থেকেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মারাঠারা এবং ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত শিখেরা স্বাধীনতা আন্দোলনের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিলো। এর প্রায় ৯ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে সারা দেশ সশস্ত্র বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সাদা মানুষের শাসনের বিরুদ্ধে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস দলের জন্ম হলো ভারতে বৃটিশ

আধিপত্যকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। এর পরিণতিতে স্বাধীনতার আকাঙ্খা আরও তীব্র হলে প্রথম প্রথম সাংবিধানকে ব্যবহার করেই স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো। পরে অবশ্য তা হিংসাত্মক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিলো। এই সময়ে ঘটেছিলো ক্ষুদিরামের বোমা ছোড়ার ঘটনা এবং এটা ঘটে ১৯০৬ সালে। সুতরাং এদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন কখনই থেমে থাকেনি। ফিনিক্স পাখির মতো এই আন্দোলনের আঁচ বরাবরই উপচে পড়েছে। উপরন্তু দেখা গেছে যে গান্ধী এই আন্দোলনে যুক্ত হবার পর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি থমকে গিয়েছে। সংবিধানগত সংগ্রাম যেটা কংগ্রেসের মধ্যপন্থীরা শুরু করেছিলো ১৮৯২ সালে এবং ১৯০৯ সালের মর্লে-মিনটো সংস্কার, ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলো স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সংবিধানগত সংগ্রামের বিশেষ একটা উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক ছিলো। গান্ধী আইন পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলেও মহান নেতারা যেমন লোকমান্য তিলক, এন সি কেলকার, সি আর দাশ, বীটল্‌ভাই প্যাটেল এবং পন্ডিত মোহন মালব্য প্রমুখেরা সংবিধানগত লড়াই থেকে ক্ষান্ত হন নি। এবার আমি উল্লেখ করতে চাই স্বাধীনতা

আন্দোলনের অনেক বিপ্লবীদের নাম। তার মধ্যে রয়েছেন সেই সব বিপ্লবীরা যেমন শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা, লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, উল্লাসকর দত্ত, মদনলাল ধিংগড়া, ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেও এবং চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ। আমি উল্লেখ করবো গদর পার্টির কথা এবং সেই 'কোমাগাতা মারু'র ঘটনাও। একথা অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে ১৯০৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সংবিধানের যে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে তার প্রত্যেকটির পিছনেই ছিলো এইসব বিপ্লবীদের ভূমিকা। এইসব কথাকে অস্বীকার করে যারা বলতে চান যে একমাত্র গান্ধীই ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তারা ইতিহাসকে বিকৃত করছেন মাত্র।

এরপর আমি উল্লেখ করতে চাই গান্ধীর সেই সব দূর্ভাগ্যজনক পরাজয়গুলিকে। এর মধ্যে রয়েছে গান্ধীর তথাকথিত অহিংস নীতি, ভারতছাড়ো আন্দোলন ইত্যাদি। অন্যদিকে দেখুন সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে। এই মহান বীর শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন না বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধও গড়ে তুলেছিলেন। আবার কংগ্রেস সভাপতির লড়াইয়ে গান্ধীর ভূমিকাটাও দেখুন, গান্ধী তখন নাকি কংগ্রেসের এক আনার সদস্যও ছিলেন

না কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুকে অন্যায়ভাবে পরাজিত করতে গান্ধী কি কোনও ভূমিকাই পালন করেন নি? তিনি কি সুভাষের বিরুদ্ধে সীতারামাইয়াকে মদত দেননি?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলতে চাই যে তাঁর মতো বিপ্লবীর তুলনা এদেশে নেই। একাগ্র মানসিকতা নিয়ে লড়াই করে তিনি দেশের সম্মানের আসনের একেবারে শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে আমি উল্লেখ করবো সেই সুভাষ বোসের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কথাও। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াব্যাপী ভারতীয় জাতীয় সেনা (আই.এন.এ) গঠনের কথাও গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা উচিত। নেতাজী সুভাষ বসু এর পরেও থেমে না থেকে গঠন করেছিলেন এক অস্থায়ী সরকারও। এই অস্থায়ী সরকারের দ্বারাই সুভাষ বসু বৃটিশ ভারত আক্রমণ করেছিলেন যার ফলেই শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শক্তি ভারত থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়। আমার ধারণা এবং এটা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে নেতাজী সুভাষ বসু যদি সত্যি সত্যি ভারতে প্রবেশ করতে পারতেন, জীবিত ও বিজয়ী হিসেবে, তাহলে সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকেই নেতা হিসেবে বরণ করে নিতেন এবং সম্মানের আসনে বসাতেন। কিন্তু গান্ধীর ভাগ্য এতই ভাল ছিলো যে ১৯২০ সালেই

লোকমান্য তিলক মারা গেলেন এবং গান্ধী ভারতবর্ষের নেতা হয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র বেঁচে থাকলে গান্ধীকে বিপর্যস্ত ও পরাজিত হতে হতো কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু হলো বিদেশের মাটিতে। এর ফলে কংগ্রেস দলের পক্ষে সুবিধে হয়ে গেলো সুভাষ অনুরাগী কোটি কোটি ভারতবাসীর আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের মন জয় করা। আই.এন.এর কিছু অফিসারদেরও কংগ্রেস নিজের দলে টেনে নিলো এবং এমনকি ১৯৪৬ সালের সেই বিখ্যাত বিচারে তারা আই.এন.এন-এ অফিসারদের পক্ষেও দাঁড়িয়ে গেলেন। কংগ্রেস নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর 'জয় হিন্দ' শ্লোগানটিকেও তাদের নিজের করে নিলো আর তার উপর ভর করেই কংগ্রেস দল ১৯৪৫-৪৬ এর নির্বাচনে বাজীমাত করলো। তারাও রাতারাতি 'সুভাষপন্থী' হয়ে গেলেন।

এরপর নাথুরাম উল্লেখ করলেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য মাত্র। নাথুরামের দৃষ্টিতে গান্ধীকে বড়জোর একজন দেশপ্রেমিক বলা যেতে পারে।

দেশভাগ নিয়ে আরো একটা কথা আমার বলার আছে। প্রায় ২০ লক্ষ প্রাণ এবং ৩০ হাজার হিন্দু নারীর ধর্মান্তরকরণের মধ্যে দিয়ে যে দেশভাগ হলো এবং দেশভাগের প্রাক্কালে বাংলার যে মুখ্যমন্ত্রীর এতে ন্যক্কার জনক

ভূমিকা (কলকাতা দাঙ্গা ইত্যাদি) ছিল গান্ধী কিন্তু সেই মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীকে আড়াল করতে ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ ভাগের পরিণতিতে যে কোটি কোটি হিন্দু অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে পড়েছিল গান্ধী সেই বিষয়ে কোনও সহানুভূতি প্রকাশ করেননি।

যাইহোক গান্ধীর এই যে দেশপ্রেমিক আচরণ তা কিন্তু তার দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছিল। আমার মতে সুভাষচন্দ্র বসুই হলেন ভারতবর্ষের প্রধান বীর এবং শহীদ। তিনি মানুষের বিপ্লবী মানসিকতাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু গান্ধী এবং তার সাগরেদরা সুভাষ বসুর এই মানসিকতাকে ধ্বংস করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

এরপর নাথুরাম পড়েছিলেন তার বক্তব্যের অনুচ্ছেদের চতুর্থ অংশটি এবং এর শিরোনাম ছিল - 'আদর্শ সম্পর্কে হতাশা'।

দেশভাগের ফলে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সম্ভাবনা চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে গেলো। তার মুসলিমপ্রীতির জন্য জিন্নার পাকিস্তান পাওয়া সম্ভব হলো। গান্ধীর অন্তরাত্মা, 'বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা' এবং সর্বপরি তার অহিংসার তত্ত্ব সবই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লো। তথাকথিত যে ঐক্যের ধারণা গন্ধী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জিন্নার শক্ত চোয়ালের কাছে তা পরাস্ত হলো। ফলে গন্ধীর উচিত ছিলো হয়

তার নীতির পরিবর্তন ঘটানো অথবা তার এই নিদারুণ পরাজয়কে স্বীকার করে নিয়ে জিন্না ও মুসলিম বিরোধী ঐক্যের যারাই দিশারী তাদের সঙ্গে যৌথসংগ্রাম গড়ে তোলা। কিন্তু গান্ধী এই বিষয়টি নিয়েও সততা দেখাতে পারেননি। তিনি দেশ এবং জাতির স্বার্থেও তার একগুঁয়ে মনোভাব পরিত্যাগ করতে পারেননি।

১৯২০ সাল থেকেই তো জিন্না ঘোষণা করে চলেছিলেন যে মুসলিম লিগ শুধুমাত্র মুসলমানদের পক্ষেই দাঁড়াবে। তাহলে তো এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কংগ্রেসকে হিন্দুদের পক্ষ অবলম্বন করাই উচিত। এটা যদি একান্তই অসম্ভব হতো তাহলে অন্তত হিন্দু স্বার্থের পক্ষ নিয়ে যারা আন্দোলন করছে তাদেরই সমর্থন করা গান্ধীর উচিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার আন্দোলনকে কংগ্রেসের অন্তত নৈতিক সমর্থন জানানো উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কংগ্রেস মুসলিম লিগের সব দাবিকেই মেনে নিলেও জাতীয় ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা যে নীতি নিয়ে চলছিল তার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে পারেনি। উপরন্তু কংগ্রেস দল হিন্দু মহাসভাকে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেই তার নিন্দা করেছে।

এই ভগ্ন ভারতবর্ষের জন্যেই কি শত শত বীর আত্মাহুতি দিয়েছে? হিন্দুরা যখন পূর্ব পাঞ্জাব, বিহার, এবং দিল্লিতে মুসলিমদের উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছিল, যা পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই বলা যেতে পাবে - গান্ধী কিন্তু হিন্দুদের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে নিন্দা করেছিলেন। গান্ধী কেন তখন পাকিস্তানের মুসলমানদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার না করার পরামর্শ দেননি।

কাশ্মীর নিয়েও গান্ধী যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাও বিশেষ নিন্দাসূচক একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। একদিকে গান্ধী অহিংসার কথা বলেছিলেন কিন্তু কাশ্মীরে কি তিনি তার অহিংসনীতির প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন? কেন গান্ধীর এই দ্বিচারিতা?

আসলে আমার মনে হয় কাশ্মীর যুদ্ধ চালানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল শেখ আব্দুল্লাকে কাশ্মীরের মসনদে বসানো। কাশ্মীরে রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে যাচ্ছে এই চিন্তা থেকেই অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে গান্ধী সমর্থন করেছিলেন। একদিকে কাশ্মীরে মরণাপন্ন ঘটনা ঘটছে অন্যদিকে কিছু মুসলমানের বিপন্নতার কারণে গান্ধী দিল্লিতে অনশনে বসছেন।

এ কেমন অহিংস নীতি?

কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে নেহরুর সিদ্ধান্তকে গান্ধী তো পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। গান্ধীর তো উচিত ছিলো সৈন্য পাঠানোর পরিবর্তে সেখানে অহিংস সত্যাগ্রহীদের পাঠানো। কাশ্মীরে রাইফেল পাঠানোর পরিবর্তে গান্ধীর কি সেখানে চরকা পাঠানো উচিত ছিল না? তাহলেই তো বোঝা যেত যে গান্ধীর অহিংসার তত্ত্ব কতটা মজবুত।

আমি এটা কখনই ভাবতে পারছি না যে বিংশ শতাব্দীতেও এই রকম একজন কপট মানুষ ভারতের মত একটা বিশাল দেশের নেতা হয়ে বসতে পারেন।

যে দিন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে গান্ধীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব সেদিনই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে এর ফলে আমি কিন্তু আমার সব কিছু হারিয়ে ফেলবো। আমি কখনই কোনও দিন টাকাওয়ালা লোক ছিলাম না। কিন্তু যে সমাজে আমি বাস করি অর্থাৎ সেই মধ্যবিত্ত সমাজে আমার একটা সম্মান ছিল ব্যবহারিক সামাজিক জীবনে আমার যে ভূমিকা ছিল তাতে মানুষেরা আমাকে সম্মানের চোখে দেখতো। আমি একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলাম এবং স্বাস্থ্যই ছিল আমার একমাত্র সম্পদ। দেহগত কোনও অপূর্ণতা আমার ছিল না। কোনও কিছুতেই আমি আসক্ত ছিলাম না। স্বভাবপ্রকৃতির দিক

থেকেও আমার মধ্যে কোনও রকম উগ্রতা ছিল না। যারা আমাকে জানতো তারা আমার শান্ত প্রকৃতির জন্য প্রশংসা করতো। আমি এটাও পরিস্কার করে জানাতে চাই যে আমি কিন্তু কখনওই কংগ্রেসের শত্রু নই। আবার এটাও কিন্তু আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমার এবং গান্ধীর মধ্যে কিন্তু কোন রকম ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা বৈরিতা কখনই ছিল না। যারা এটা বলেন যে পাকিস্তানকে সমর্থন করার পেছনে গান্ধীর কোনও সৎ উদ্দেশ্য ছিল তাদের উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলতে চাই তা হল আমি চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার শুধু পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে যে অবর্ণনীয় কষ্টের ইতিহাস রয়েছে তাকেই বিবেচনা করেছিলাম। আমি একটি কথা বারবার ঘোষণা করছি যে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে শুধু একজনকেই জবাবদিহি করতে হবে এবং শুধু একজনই পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এবং তিনি হলেন গান্ধী এবং গান্ধী। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে বহু মানুষকেই প্রতারিত করা হয়েছে। এই রাষ্ট্র গঠন নিয়ে পাঞ্জাব, বাংলা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশের কোনও মানুষেরই মতামত গ্রাহ্য করা হয়নি।

তাই এইসব ঘটনায় আমি নিদারুণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। এমনকি পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও

আমি যদি দেখতাম যে এই গান্ধীবাদী সরকার পাকিস্তানে বসবাসকারি আতঙ্কগ্রস্ত এবং অত্যাচারিত হিন্দুদের পেছনে দাঁড়িয়েছে তাহলেও আমি আমার নিজের মনকে সংযত করতে সক্ষম হতাম। গান্ধী এবং তার অনুগামীরা কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বার বার আবেদন জানিয়েছিলেন যে তারা যেন কখনওই পাকিস্তান পরিত্যাগ না করেন। কিন্তু এর ফলে তো মুসলমানেরা আরও সুবিধে পেয়ে গেল হিন্দুদের উপর অত্যাচার করার যেটা পাকিস্তানের হিন্দুরা কখনওই বুঝতে পারেনি। এর পরিণতিতে ঘটলো নানা হত্যাকান্ডের ঘটনা। এইসব ঘটনার কথা মনে হলেই আমার মনের অঙ্গনে যেন আগুন ঝরতে থাকে। তবুও আমি বলতে চাই যে এই ঘটনা (গান্ধী হত্যা) যদি না ঘটত তাহলে তা আমার পক্ষে ভালই হতো। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এর ফলে আর আমার হাতের মধ্যে থাকলো না। তাই আমি মনে করলাম এই মানুষের কখনোই স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে দেওয়া যায় না, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে তার ভূলের মাসুল তাকে প্রাণ দিয়েই চুকোতে হয়েছে। আমি প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন তাঁর সৃষ্ট এই পবিত্র ভূমিকে কলুষিত করার অপরাধ থেকে।

## ফাঁসির তিনদিন আগে নাথুরাম তার পিতা মাতার উদ্দেশ্যে যে শেষ চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ

বিচার সভায় আমি আমার লেখা বিবৃতিটি পড়তে সময় নিয়েছিলাম প্রায় পাঁচ ঘন্টা। প্রথম এক ঘন্টার পর আমার একটি পায়ে সামান্য যন্ত্রণার কারণে আমি আমার দেহের ভারসাম্য কিছুটা হারিয়ে পেরেছিলাম। আসলে আমাকে তো অনেকদিন এভাবে একনাগাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। তাই হয়তো এমনভাবে ভারসাম্য হারানো।

যাইহোক এর পরের চারঘন্টা আমার বিবৃতি পড়তে আর কোনও অসুবিধে হয়নি। অবশ্যই পাঁচঘন্টার মধ্যে প্রায় ১৫-২০ মিনিট আমি বসেই বিবৃতিটি পড়েছিলাম। যেখানে বিচার সভাটি বসেছিল অর্থাৎ সেই কোর্ট ঘরে প্রবেশ নিয়ে বেশ কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু যেদিন যেদিন আমার বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হত সেই দিনগুলোতে ভিড় হত খুব বেশি। শুধু তাই নয় সেই দিনগুলোতে অনেক গণ্য মান্য ব্যাক্তিদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন বেশ কিছু উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীও। এছাড়া অবশ্য বেশকিছু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ তো ছিলেনই। কোর্ট রুমে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা আমার বক্তব্যে এমনই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে দীর্ঘ ৫ ঘন্টা তাঁরা নড়াচড়া করতে পারেননি। শুধু তাই নয় আমার বক্তব্য যখন শেষ হল তখন তাঁরা আদালতের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এসে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। ইতি মধ্যেই কেউ কেউ জেনে ফেলেছিলেন যে আমার কফির প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কথা। তাই তাঁরা বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট কফি তৈরি করে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমার বক্তব্য বেশ উচ্চ মানের ছিল যদিও এই সময়টা ছিল খুবই প্রতিকূল।

## গান্ধী হত্যাকান্ডের ঘটনা পরিক্রমা

১৯৪৬ সাল -

কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা

১৫ই আগষ্ট, ১৮৪৭ -

ভারত ভাগ

৯ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ - **ভি. কারকারে** এবং অন্যান্যরা পুনা শহরে অবস্থিত শাস্ত্র ভান্ডারে গিয়ে অস্ত্র পরীক্ষা করেন।

১২ই জানুয়ারী - দিল্লীতে ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী **বল্লভ ভাই প্যাটেল** পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহর করেন।

* **বিড়লা হাউসে** গান্ধী আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১৪ই জানুয়ারী - **নাথুরাম গডসে** তার ৩০০০ টাকার এল.আই.সি পলিসি গোপাল গডসে-কে সমর্পণ করেন।

* কিরকিতে, তার কর্মস্থলে **গোপাল গডসে** সাত দিনের ক্যাজুয়াল লিভ-এর জন্য আবেদন করেন।

১৫ই জানুয়ারী - বোম্বাইতে দিগম্বর বাদগে নারায়ণ আপ্তেকে অস্ত্র সরবরাহ করেন।

* বোম্বাইতে **নারায়ণ আপ্তে** একটি বিমানের দুটি আসনের টিকিট কাটেন যেটি বোম্বাই থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবে ১৭ই জানুয়ারী।

* **বিষ্ণু কারকারে** এবং **মদনলাল** বোম্বাই থেকে দিল্লী যাওয়ার জন্য রাতের ট্রেন ধরেন।

১৬ই জানুয়ারী - **গোপাল গডসে** আরও সাত দিনের ক্যাজুয়াল লিভের জন্য আবেদন করেন।

১৭ই জানুয়ারী - দিল্লীর নাগরিকেরা গান্ধীর কাছে সাত দফা দাবী পেশ করেন।

* বোম্বাইতে নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তে অর্থ সংগ্রহ করেন।
* নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তে বোম্বাই থেকে বিমানে দিল্লী পৌছান বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে।
* গোপাল গডসের ৭দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়।
* বিষ্ণু কারকারে এবং মদনলালও বিকেলের ট্রেনে দিল্লী পৌছান।

১৮ই জানুয়ারী - দিগম্বর বাদগে এবং শংকর বোম্বাইতে সকালে ট্রেন ধরেন।

* গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯শে জানুয়ারী - গোপাল গডসে-কে দেখা যায় দিল্লীর সেরিফ হোটেলে।

* দিগম্বর বাদগে এবং শংকর রাতে দিল্লী পৌছান।

২০ জানুয়ারী - নারায়ণ আপ্তে এবং শংকর বিড়লা হাউস পরিদর্শন করেন।

* এই দু'জন বিকেলে দিল্লীর মেরিনা হোটেলের ৪০নম্বর কামরায় ওঠেন।
* বিকেল ৫টায় বিড়লা হাউসে বোমা বিস্ফরণ ঘটানো হয়।
* বিড়লা হাউস সংলগ্ন. এলাকায় মদল লালকে গ্রেপ্তার করা হয়।
* নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তে দিল্লী থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

২৩ শে জানুয়ারী - নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তে ছদ্মনামে বোম্বাইয়ের 'আর্যপাঠক আশ্রম' হোটেলে ওঠেন।

২৪শে জানুয়ারী - নারায়ণ আপ্তে এবং নাথুরাম গডসে হোটেল পরিবর্তন করে, এলফিন স্টোন অ্যানেক্স হোটেলে ওঠেন।

২৫শে জানুয়ারী - বোম্বাইতে একটি সাধারণ বিমানে দু'জনের টিকিট সংরক্ষণ করেন নারায়ণ আপ্তে।

* বিকেলে নারায়ণ আপ্তে, নাথুরাম গডসে, বিষ্ণু কারকারে এবং গোপাল গডসে মিলিত হন মহারাষ্ট্রের থানে-তে - শ্রী ডি.এম যোশীর বাড়িতে।

২৬শে জানুয়ারী - গোপাল গডসের কাজে যোগদান।

২৭শে জানুয়ারী - নারায়ণ আপ্তে এবং নাথুরাম গডসে সকাল ৯টার বিমানে বোম্বাই থেকে যাত্রা।

* তারা দিল্লী পৌঁছান ১২টা ৪০ মিনিটে।
* রাতে তারা গোয়ালিয়র যাওয়ার ট্রেন ধরে।
* রাতেই তারা গোয়ালিয়ার পৌঁছান।

২৯শে জানুয়ারী - নাথুরাম গডসে, নারায়ণ আপ্তে এবং বিষ্ণু কারকারে রাতে দিল্লী ষ্টেশনের রিটায়ারিং রুমে থাকেন।

৩০শে জানুয়ারী - নাথুরাম গডসে বিড়লা হাউসের মধ্যে গান্ধিকে হত্যা করেন বিকাল ৫টা ১৭ মিনিটে।

এমনকি পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও আমি যদি দেখতাম যে এই গান্ধীবাদী সরকার পাকিস্তানে বসবাসকারি আতঙ্কগ্রস্ত এবং অত্যাচারিত হিন্দুদের পেছনে দাঁড়িয়েছে তাহলেও আমি আমার নিজের মনকে সংযত করতে সক্ষম হতাম। গান্ধী এবং তার অনুগামীরা কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বার বার আবেদন জানিয়েছিলেন যে তারা কখনওই পাকিস্তান পরিত্যাগ না করেন। কিন্তু এর ফলে তো মুসলমানেরা আরও সুবিধে পেয়ে গেল হিন্দুদের উপর অত্যাচার করার, যেটা পাকিস্তানের হিন্দুরা কখনওই বুঝতে পারেনি। এর পরিণতিতে ঘটলো নানা হত্যাকান্ডের ঘটনা। এইসব ঘটনার কথা মনে হলেই আমার মনের অঙ্গনে যেন আগুন ঝরতে থাকে। তবুও আমি বলতে চাই যে এই ঘটনা (গান্ধী হত্যা) যদি না ঘটত তাহলে তা আমার পক্ষে ভালই হতো। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এর ফলে আর আমার হাতের মধ্যে থাকলো না। তাই আমি মনে করলাম এই মানুষের কখনওই স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে দেওয়া যায় না, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে তার ভুলের মাশুল তাকে প্রাণ দিয়েই চুকোতে হয়েছে। আমি প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন তাঁর সৃষ্ট এই পবিত্র ভূমিকে কলুষিত করার অপরাধ থেকে।